OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 44 - 52
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

জীবনের উপেক্ষিত খুঁটিনাটি : সরোজকুমার রায় চৌধুরীর গল্পের অন্তর্দৃষ্টি

ড. বরুণ কুমার মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, পি.পি.কে. কলেজ
Email ID: b.k.mondal14@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Saroj Kumar Roy Choudhury, Bengali Short Story, Shreshtha Galpa, Psychological Realism, Domestic Nuances, Rural Ethos, Kallol Era, Existentialism.

Abstract

This paper offers an in-depth critical exploration of the short stories of Saroj Kumar Roy Choudhury, a distinctive yet often understated voice in twentieth-century Bengali literature. While contemporary writers of the Kallol and Kali-Kalam era often pursued aggressive modernism, urban disillusionment, and explicit psychological rebellion, Roy Choudhury maintained a steadfast connection to the authentic soil, rural ethos, and timeless human emotions of Bengal. Rather than depending on dramatic climaxes or overt ideological rhetoric, his narrative craft excels in illuminating the neglected trivialities, quiet domestic tensions, and subtle psychological undercurrents of everyday human existence.

Through a comprehensive examination of stories selected from his anthology Shreshtha Galpa— such as 'Dehayamuna', 'Man-Paban', 'Mukti', 'Byaghra-Debata', 'Mrityur Rupa', 'Shani Rabi Som', 'Banashpatir Dukhkha', and 'Nibarner Mrityu' — this study traces Roy Choudhury's profound narrative vision. The analysis highlights how he unmasks the repressed biological and emotional longings of an ascetic Hindu widow in 'Dehayamuna', the painful curtailment of childhood spontaneity under patriarchal matrimony in 'Man-Paban', and the quest for true spiritual freedom beyond rigid social norms in 'Mukti'. Furthermore, the paper unpacks his sharp socio-psychological satire of folk belief and mass panic in 'Byaghra-Debata', alongside existential reflections on human mortality and cosmic detachment in 'Mrityur Rupa' and 'Nibarner Mrityu'.

By intertwining delicate pathos with gentle irony, Roy Choudhury portrays ordinary, marginal lives against the broader backdrop of natural continuity and temporal transitions. Ultimately, this paper underscores that Roy Choudhury's unique narrative power lies in elevating the overlooked nuances of ordinary life into profound, enduring art, thereby securing an irreplaceable legacy in the evolution of the modern Bengali short story.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

।। ১ ।।

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক ভাঙন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যিক ভাবান্দোলনের প্রভাবে যখন বাংলা ছোটগল্পের রূপ ও রীতিতে এক অভাবনীয় পালাবদল সূচিত হচ্ছিল, তখনই স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বতন্ত্র শিল্পবোধ নিয়ে আবির্ভূত হন সরোজকুমার রায়চৌধুরী। তিনি কল্লোল ও কালিকলম পর্বের সমকালীন সাহিত্যিক স্রোতের সান্নিধ্যে এসেও কোনো উগ্র আধুনিকতাবাদী সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর সাহিত্যসাধনার উৎসভূমি ছিল বাংলার মূল মৃত্তিকা সংলগ্ন চিরন্তন মানবপ্রকৃতি। জীবনের অতিসাধারণ, অনালোকিত ও প্রান্তিক মুহূর্তগুলিকে তিনি এক নিবিড় দরদ ও মমত্ববোধের আলোয় উদ্ভাসিত করেছিলেন। আধুনিক জীবনের কৃত্রিম চটুলতা বা আকস্মিক চমক সৃষ্টির মোহ ত্যাগ করে তিনি মানুষের অন্তর্জগতের নিভৃত আকুতি, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং বহমান প্রকৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সংবেদনাকে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই জীবনমুখী সৃষ্টিশীলতার পরিচয় মেলে তাঁর জীবনচর্যা, সমাজবীক্ষা এবং সাহিত্যের সামগ্রিক পটভূমির গভীর রূপায়ণে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর জীবনবৃত্তের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় তাঁর সৃষ্টির ভিত্তিভূমি কীভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। ১৯০৩ সালে বিহারের গিরিডিতে তাঁর জন্ম হয়। শৈশব ও কৈশোরের বিস্তীর্ণ সময় তিনি কাটিয়েছেন ছোটনাগপুরের উন্মুক্ত রুক্ষ-শ্যামল পটভূমি এবং মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটি গ্রামে পৈতৃক আবাসে। সালার হাইস্কুল থেকে ১৯১৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভর্তি হন হাজারিবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজে। কিন্তু সেই সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর তরুণ মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং দেশজুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল ঢেউয়ে উদ্বেলিত হয়ে ১৯২১ সালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই পর্বেই তিনি দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং জাতীয়তাবাদের বাস্তব আদর্শে দীক্ষিত হন। দেশাত্মবোধের তাগিদেই তিনি তৎকালীন সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বর্জন করে কলকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয় বা ন্যাশনাল কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনৈতিক সংগ্রামের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে তৈরি করেছিল সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দেশের আপামর প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার অন্তর্দৃষ্টি। কর্মজীবনে তিনি প্রবেশ করেন সাংবাদিকতায়, সম্পাদনা ও সংবাদসেবার সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবনের নানা স্তরের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা সাংবাদিকতার স্থূল বাস্তবতাকে অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিল বিশুদ্ধ সাহিত্যের রসলোকে।

গ্রন্থের সূচনাতেই যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেখানে তাঁর এই বর্ণময় সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর আবির্ভাবের গুরুত্ব নির্দেশ করে ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে—

> "লেখক হিসাবে সরোজকুমারের ভবিষ্যৎ এই সময়ই সূচিত হয়। সাংবাদিক সরোজকুমারের পরিচয়ও এই সময়ই পাওয়া যায়। বর্তমানে তিনি বাংলাসাহিত্যের একজন সার্থকনামা শক্তিশালী লেখক।"[১]

এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর মূল্যায়ন স্পষ্ট করে দেয় যে, তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি কোনো আকস্মিক মোহের ফল ছিল না। সাংবাদিকতার সূত্রে মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জীবনের মাটি ও মানুষকে গভীরভাবে আবিষ্কার করাই ছিল তাঁর পরবর্তী কথাসাহিত্যের প্রধান শক্তি। ফলে তাঁর রচিত গল্পে কোনো বিমূর্ত কল্পনাবিলাস ঠাঁই পায়নি; বরং সেখানে এসেছে মাটির টান, গৃহকোণের নিভৃত কান্নাহাসি এবং সামাজিক পরিবর্তনের ভেতরে সাধারণ নর-নারীর টিকে থাকার চিরন্তন লড়াই।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'শ্রেষ্ঠগল্প' সংকলনের ভূমিকাটি কেবল একজন লেখকের গল্পপাঠের প্রবেশক নয়, তা সামগ্রিকভাবে বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন এবং গ্রামীণ ও চিরন্তন জীবনবোধের এক গভীর তাত্ত্বিক ও নান্দনিক বিশ্লেষণ। সেখানে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে যে, খাঁটি সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে ভূগোল ও মৃত্তিকার গভীর সম্পর্ক থেকে। নদীমাতৃক বাংলার ভৌগোলিক রূপ, তার পলিমাটির আর্দ্রতা এবং অন্যদিকে মাঠ-প্রান্তরের অবারিত বিস্তৃতি বাঙালির মনন ও মেজাজকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গড়ে তুলেছে যুগ যুগ ধরে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য থেকে বৈষ্ণব পদাবলী এবং রূপকথা থেকে ব্রতকথা— সর্বত্রই বাঙালির এই দ্বিমুখী স্বভাব লক্ষ করা যায়। একদিকে সংসারে নিবিড় আসক্তি ও পারিবারিক মায়াজাল, অন্যদিকে বিশাল উদার আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সংসারকে অনিত্য ভেবে স্মিত কৌতুক ও বৈরাগ্যবোধ। বাংলা সাহিত্যে যখন ছোটগল্পের আবির্ভাব ঘটল, তখন এই মাটির গন্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য কীভাবে বজায় রইল, তা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকাটিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে একজন সৎ লেখকের মনন গঠনের প্রক্রিয়া। সেখানে বলা হয়েছে—

> "'মাটির কাছাকাছি' যেকোনো সং লেখককেই থাকতে হয়। সেই মাটির আর্দ্রতা অথবা ঊষরতা লেখকের মনকে গঠন করে। নদীমাতৃক বাংলা দেশ তার জীবনীকারদের মনকে চিরকাল যেমন করুণরসে স্নিগ্ধ করেছে, তেমনি বাঙলার আদিগন্তবিস্তৃত পথপ্রান্তর, সূর্যকরোজ্জ্বল উদার নীলিমা সেই মনে শান্ত বৈরাগ্য ও স্মিত কৌতুকের সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে। সংসারে আসক্ত করেছে যেমন, সংসার থেকে মোহমুক্তি ও ঘটিয়েছে।"[২]

এই বক্তব্য সরোজকুমারের সমগ্র সাহিত্য চেতনার মূল দর্শনকে উন্মোচিত করে। তিনি যে মাটির সংস্পর্শে বড় হয়েছেন, যে মাটির মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসকে তিনি অনুভব করেছেন, সেই মাটিই তাঁকে শিখিয়েছে জীবনের অতি সামান্য তুচ্ছতাকে ভালোবেসে গ্রহণ করতে। সংসারে প্রতিদিন যে ক্ষুদ্র আনন্দ-বেদনা, মায়ার বন্ধন আর ক্ষণিকের বিবাদ-মিলন ঘটে চলে, তাকে তিনি যেমন স্নেহের চোখে দেখেছেন, তেমনই এক বৃহৎ মহাজাগতিক নির্লিপ্ততা থেকেও তিনি সেই ক্ষুদ্রতাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে ভূমিকার লেখক বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও বিকাশের ধারাবাহিকতাকে চমৎকারভাবে যুক্তিবিন্যাসে সাজিয়েছেন। আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কীভাবে যৌথ পরিবারকে ভেঙে ক্ষুদ্র করে তুলল এবং ব্যক্তির অন্তরের কথা ব্যক্ত করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই যে ছোটগল্পের জন্ম হলো, তা গভীর তাত্ত্বিক আলোকে দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্র-পূর্ব ও রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এই শিল্পের অগ্রগতি আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে গ্রামজীবনের শাশ্বত রূপের ওপর। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের যে অবিস্মরণীয় ধারা, যেখানে পল্লীপ্রকৃতির বিস্তার আর মানুষের গৃহকোণের বেদনা-মধুর অনুভূতি মিলেমিশে একাকার হয়েছে, সেই ঐতিহ্যকেই আধুনিককালের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতেও সেই হাসি-কান্নার রসায়ন সমানভাবে বহমান ছিল। মানুষের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন প্রকৃতির বিশালতার মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন এক অদ্ভুত বিষাদ আর নির্লিপ্ত কৌতুকবোধের জন্ম হয়।

ভূমিকার সেই গভীর উপলব্ধিময় অংশটি সরোজকুমারের শিল্পমনস্তত্ত্ব অনুধাবনে অত্যন্ত জরুরি। সেখানে জীবন ও দর্শনের সেই দ্বান্দ্বিক মেলবন্ধনকে নির্দেশ করে লেখা হয়েছে—

> "এর কারণ আর কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়, উন্মুক্ত আকাশ আর বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে চেয়ে তাদের পটভূমিতে মানুষের ছোট ছোট সংসারকে যখন বড়ো তুচ্ছ মনে হয়, মানুষের স্বপ্নকামনা চেষ্টা সাফল্য বৃহৎ বিশাল পৃথিবী ও প্রকৃতির মাঝখানে যেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়, তখন দুঃখ হয়, বেদনা জমে; সাথে সাথে উদার ঔদাস্যে মন ভরে যায়। নিকটজনের অশ্রুপাতের পাশে দূরজনের কৌতুকবোধ সমান মূল্যবান মনে হয়। একত্র প্রবাহে দুইই বয়ে চলে জীবনকে রঙিয়ে রসিয়ে।"[৩]

সরোজকুমারের গল্পে এই দ্বৈত অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি নিজেদের ছোট ক্ষুদ্র অভাব, দ্বিধা বা ঈর্ষা নিয়ে যখন জর্জরিত হয়, লেখক তখন তাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ বা রূঢ় বিচারকের মনোভাব প্রকাশ করেন না; বরং এক ধরনের করুণ কোমলতায় তাদের দুর্বলতাকে পরম আদরে স্পর্শ করেন। অশ্রু এবং কৌতুকের এই সহাবস্থানই তাঁর ছোটগল্পকে সাধারণ বাস্তবতা থেকে এক শাশ্বত সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কল্লোল যুগের সাহিত্য আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ, আধুনিকতার নামে যৌনচেতনার উন্মোচন এবং পাশ্চাত্য নগর-যন্ত্রণার কৃত্রিম অনুকরণ। সরোজকুমার রায়চৌধুরী সেই কালখণ্ডে লিখেও কেন কল্লোলীয় আধুনিকতার প্রবল স্রোতে ভেসে যাননি, ভূমিকাটিতে তার একটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাদৃপ্ত ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। সাময়িক সাহিত্যিক আন্দোলন বা নিছক চমকদারী নিরীক্ষা যে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের একমাত্র লক্ষণ নয়, তা লেখকের মানসিক গঠন বিচার করে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি কল্লোল বা কালিকলমের মতো প্রগতিশীল সাহিত্যপত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের অতি-বিপ্লবী ভঙ্গিকে নিজের সৃষ্টির মূল প্রেরণা করেননি। তিনি বুঝেছিলেন, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে চিরন্তন শাশ্বত সত্য বহমান, তার গভীরতা কোনো সাময়িক সাহিত্যিক শোরগোলের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী।

এই স্বাতন্ত্র্য এবং তাঁর সাহিত্যিক অটলতাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভূমিকার অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্যটি আমাদের বিশেষভাবে পথ দেখায়। সেখানে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে লিপিবদ্ধ হয়েছে—

> “এই স্থায়ী ও শাশ্বত জীবনবোধের মূলধন নিয়ে যাঁরা এগোন তাঁদের শিল্পকর্মে স্বভাবতই সাময়িকতা খুব বেশি ছায়াপাত করে না। তাঁদের মনে কোনো বিশেষ সাহিত্যভাবের আন্দোলন তেমন কিছু উৎসাহ বয়ে আনে না। সরোজকুমার গোড়া থেকেই এই মূলধনের কারবারী। তাই ‘কল্লোল’, ‘কালি-কলমে’র সাথে এককালে যুক্ত হয়েও তিনি ঠিক তাদের প্রত্যক্ষ বিদ্রোহে কোনদিন অংশ নেননি।”[৪]

এই উক্তিটি সরোজকুমারের সামগ্রিক সৃষ্টির ওপর আলোকপাত করার এক অমোঘ চাবিকাঠি। সমকালের উগ্র মতাদর্শগত উন্মাদনার মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি নিজের মাটির দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারেন, যিনি সমসাময়িক ফ্যাশনের কাছে আত্মসমর্পন না করে মানুষের শাশ্বত হৃদয়ের কারবারী হতে পারেন, তিনিই সরোজকুমার। কল্লোল যুগের যে তথাকথিত বিদ্রোহ, তা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও অনেক ক্ষেত্রেই জীবনসত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; কিন্তু সরোজকুমার জীবনের যে গভীর মূলধনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর দেখা গ্রামের মাটি, মেঠো পথ, নদীপারের বাতাস এবং মানুষের অনির্বাণ মায়াবোধ।

এইভাবে ভূমিকার সমগ্র বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর অন্তর্দৃষ্টির মূল কেন্দ্রে ছিল জীবনের উপেক্ষিত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি। সমাজ যাদের দিকে ফিরে তাকায় না, যে ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের মুহূর্তগুলি বড় বড় ঘটনার ভিড়ে হারিয়ে যায়, সেই আপাত-অকিঞ্চিৎকর অনুভূতিগুলিকেই তিনি সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদে পরিণত করেছেন। কোনো তাত্ত্বিক আস্ফালন ছাড়াই তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের দৈনন্দিন সংকটের মধ্যে নিজের অজান্তেই মহৎ মানবিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে যেমন বাস্তবনিষ্ঠ, অন্যদিকে তেমনই আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ততায় স্থিতধী। প্রকৃতির সুবিশাল পটভূমিতে মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের লড়াইকে তিনি যে মমতায় রূপায়িত করেছেন, তা বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক অমূল্য সংযোজন। ভূমিকার তাত্ত্বিক আলোচনা এবং তাঁর জীবন ও সৃষ্টির এই নিখুঁত পরিচয় থেকে এটিই অনস্বীকার্য সত্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সরোজকুমার রায়চৌধুরী বাংলা ছোটগল্পকে সমকালীন হুজুগের হাত থেকে রক্ষা করে মাটির গভীরে প্রোথিত শাশ্বত জীবনবোধের ভিত্তিমূলে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

।। ২।।

বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয় তাঁর অতি-সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ ও জীবনের আপাত-উপেক্ষিত কোণগুলিতে আলো ফেলার অসামান্য দক্ষতায়। কল্লোল যুগের তীব্র আধুনিকতাবাদী বিদ্রোহ, যৌনতার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ কিংবা কৃত্রিম নগর-হতাশার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি বাংলার পল্লী ও প্রান্তিক মধ্যবিত্ত জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত, অবদমিত আবেগ এবং সাংসারিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাসকে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য করেছিলেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কোনো আকস্মিক চমক সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিল না; বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আনন্দ-বেদনা, সামাজিক শৃঙ্খল ও মানবিক অস্তিত্বের নিভৃত আকুতিকে তিনি এক নিবিড় মমতায় উন্মোচিত করেছেন। সংকলিত শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরতে পরতে এই জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটেছে, যেখানে বৃহৎ ঘটনার চেয়ে জীবনের অনালোকিত খুঁটিনাটিই গভীরতর তাৎপর্য বহন করে।

'দেহযমুনা' গল্পে সরোজকুমার হিন্দু যৌথ পরিবারের বিধবা নারীর অবদমিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধার যে গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন, তা তথাকথিত ভাবালুতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অকালবিধবা সতীর নিভৃত জীবনযন্ত্রণাকে বাইরে থেকে চেনার উপায় ছিল না; সমাজ তাকে এক পবিত্রতার মোড়কে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু রক্তের ভেতরের যে জৈবিক সত্য এবং মাতৃত্বের যে দুর্নিবার তৃষ্ণা, তা একদা আশ্রয় খোঁজে দাদার কোলের সন্তান মটরুর মধ্যে। সতী যখন সন্তানহীন শূন্যতাকে পূর্ণ করতে মটরুকে আঁকড়ে ধরে, তখনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারীর অস্তিত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব আরও তীক্ষ্ণ রূপ নেয় যখন গৃহশিক্ষক কৃষ্ণকিশোরের আবির্ভাব সতীর অগোচরে হৃদয়ে দোলা দেয় এবং বৈপরীত্য হিসেবে রাতের অন্ধকারে দাদা ও বৌদির স্বাভাবিক দাম্পত্য আনন্দের রূপ তার নিদ্রাহীন চোখে ধরা পড়ে। সতীর এই গোপন দহন লেখক প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত সংযত ভাষায়, যেখানে সামাজিক ভণ্ডামি এবং জৈবিক আকাঙ্ক্ষার সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সতীর মানসিক রূপান্তরের সেই করুণ মুহূর্তটিকে লেখক নিখুঁত তুলির টানে এঁকেছেন, যখন সে কৃত্রিমভাবে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেও দেহের অবধারিত সত্যের কাছে পরাস্ত হয়। রোগশয্যায় সতীর এই নিদারুণ অসহায়তাকে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন—

> "দেহযমুনায় ছদিনের বানডাকা শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে নদীর গতিপথও পরিবর্তিত হইল। সতী উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, আর রাত্রে নিভৃতে একান্ত গোপনে স্বামীর অস্পষ্ট মূর্তি ধ্যান করে।"[৫]

এখানে 'দেহযমুনা' কেবল একটি প্রতীক নয়, নারীর রক্তমাংসের জৈবিক জোয়ার-ভাঁটার এক মর্মস্পর্শী রূপক। অকালবৈধব্যের অচলায়তনে সতীর এই নীরব আত্মক্ষয়ই সমাজের চোখে উপেক্ষিত থেকে যায়, যা সরোজকুমারের অন্তর্দৃষ্টিতে এক চিরন্তন মানবিক ট্র্যাজেডি হিসেবে ধরা দিয়েছে।

শৈশব থেকে অকস্মাৎ নারীর পূর্ণতায় উত্তরণের যে ট্র্যাজিক মুহূর্ত, তা নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে 'মন-পবন' গল্পে। বারো-তেরো বছরের চঞ্চল বালিকা নীলা যখন পূর্ণবয়স্ক, আদর্শবাদী ও রাশভারী যুবক লক্ষ্মীনারায়ণের সংসারসীমায় বধূ হয়ে প্রবেশ করে, তখন তার মুক্ত শৈশব কীভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে, তা গল্পটির মূল সুর। পেয়ারা পাড়ার খেলার সাথী বটুক কিংবা তুচ্ছ ফাউন্টেন পেন নিয়ে মারামারি করা সমবয়সী ভাগ্নে যতীশের জগৎ থেকে তাকে এক লহমায় টেনে আনা হয় দাম্পত্যের কৃত্রিম গাম্ভীর্যে। লক্ষ্মীনারায়ণের পিস্তুতো ভাই পটলার সঙ্গে লুকোচুরি বা লুডো খেলার যে অবাধ চঞ্চলতা, তা লক্ষ্মীনারায়ণের দৃষ্টিতে অনভিপ্রেত ঠেকে। স্বামীর উগ্র গম্ভীর ব্যক্তিত্ব ও সমাজবিধির চাপে কিশোরী নীলার মনের ভেতরের শিশুটি কীভাবে মাত্র একটি দিনে পিষ্ট হয়ে যায়, সরোজকুমার তা দেখিয়েছেন অসীম মমতায়।

পটলার পলায়ন ও লক্ষ্মীনারায়ণের রূঢ় শাসনের পর নীলার জীবনের সেই চিরন্তন মোড় পরিবর্তনের মুহূর্তটিকে লেখক এক অমোঘ দার্শনিক সত্যে প্রকাশ করেছেন। বাল্যমুগ্ধতার অবলুপ্তি ঘটিয়ে বাস্তব সংসারের ছাঁচে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার সেই রূপান্তর নির্দেশ করে গল্পে বলা হয়েছে—

> "কিন্তু যে মেয়েটি জন্মের মতো হারিয়ে গেল, সে তখন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে ফার্স্ট বুকের পড়া মুখস্থ করছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ লেখাপড়ার পক্ষপাতী।"[৬]

এই সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ বাক্যটিতে একটি চঞ্চল প্রাণের অকালমৃত্যুর হাহাকার লুকিয়ে আছে। সমাজ ও সংসারের দাবিতে নারী কীভাবে নিজের অবাধ সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে বাধ্য স্ত্রীর ভূমিকায় প্রবেশ করে, এই আপাত-সাধারণ পারিবারিক ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের সেই চরম সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'মুক্তি' গল্পে প্রচলিত নীতিবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক পবিত্রতার মুখোশ খুলে জীবনের সত্যকার দাবিকে বড় করে তোলা হয়েছে। খবরের কাগজে সন্ন্যাসী ও নারীকে নিয়ে মুখরোচক খবর প্রকাশিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক সাংসারিক কৌতূহলের জন্ম দেয়; কিন্তু সেই খবরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা রক্তমাংসের মানুষের দীর্ঘশ্বাস সমাজ খোঁজার চেষ্টা করে না। সুরেন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ওরফে স্বামী অমৃতানন্দ যখন আশ্রমে পাণ্ডিত্য ও কঠোর তপশ্চর্যা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল তিনি জাগতিক মায়ামুক্ত। কিন্তু পূর্বাশ্রমের প্রণয়িনী খুশি— যে এক অন্ধ ধনী স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত হয়ে অশুচিতা ও মানসিক গ্লানিতে ধুঁকছিল— আশ্রমে আসতেই সন্ন্যাস জীবনের সেই কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে পড়ে। আশ্রমের গুরুর নির্দেশে সন্ন্যাসের চেয়েও কঠিন যে গৃহধর্ম, সেই সত্যের মুখোমুখি হতে সুরেন ফিরে আসে কলকাতায়, অভাবের সংসারে।

দারিদ্র্য পীড়িত বৌবাজারের স্যাঁতসেঁতে বাসায় গহনা বিক্রি করে সংসার চালানোর চরম বাস্তবতার মধ্যেও খুশির জীবনে যে মুক্তি এসেছে, তা তথাকথিত সামাজিক বৈধতার চেয়েও মহত্তর। বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সুরেনের কথোপকথনে খুশির সেই অবদমিত যন্ত্রণাটি উঠে আসে, যেখানে লেখক সামাজিক শৃঙ্খল ও আত্মিক অনুভূতির ব্যবধানকে চিহ্নিত করেছেন—

> "তাঁর তো কোনো দোষ নেই। দিব্যি ভদ্রলোক। কিন্তু খুশি সেখানে থাকতে পারে না। বলে, কেমন গ্লানি বোধ হয়।"[৭]

প্রচলিত সংসারে নারীর এই আত্মিক অস্বস্তি বা 'গ্লানি' প্রায়শই তুচ্ছ ও ভিত্তিহীন বলে উপেক্ষিত হয়। কিন্তু সরোজকুমার দেখিয়েছেন, প্রেমহীন ও মূল্যহীন বৈবাহিক জীবনের চেয়ে ভালোবাসার আশ্রয়ে অভাবের জীবনই নারীর কাছে প্রকৃত 'মুক্তি'। জীবনের এই মানসিক সত্যকে অনুধাবন করাই তাঁর কথাশিল্পের অনন্য বিশিষ্টতা।

গ্রামবাংলার সামাজিক মনস্তত্ত্ব, লোকবিশ্বাস এবং সংকটের মুহূর্তে মানুষের বিচিত্র আচরণের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় 'ব্যাঘ্র-দেবতা' গল্পে। একটি খেতখামারের এলাকায় লোকালয়ে বাঘ আসার আকস্মিক আতঙ্ক কীভাবে পুরো গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার দৈনন্দিন ছন্দকে ভেঙে দেয়, তা সরোজকুমার নিপুণ কৌতুকে তুলে ধরেছেন। মানুষ যখন বিপদের মুখোমুখি হয়, তখন তার স্বভাবসুলভ বীরত্ব, ভণ্ডামি ও ভীতি পাশাপাশি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। জাত-পাঠান পাঁচু সেখের লাঠিয়ালি আস্ফালন, বড়বাবুর ঘরের কোণে কাস্তে হাতে বসে থাকা কিংবা চন্দরার হিসেবী চাতুর্য— সবকিছুই পল্লীচরিত্রের রক্তমাংসের বাস্তব রূপ। কিন্তু গল্পের সবচেয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশিত হয় যখন আতঙ্কিত মানুষের দল বাঘটিকে পিটিয়ে হত্যা করার পর তাদের সামগ্রিক মনস্তত্ত্বের অভাবনীয় মোড়বদল ঘটে।

মৃত হিংস্র পশুর ওপর যখন গ্রামের মহিলারা ভক্তিভরে প্রণাম করতে আসে এবং চাটুয্যেগিন্নী ঘটির জল ঢেলে তাকে ঐশ্বরিক অবতার হিসেবে বরণ করে নেন, তখন লেখক লোকায়ত সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও ভীতি-উৎসারিত ভক্তির স্বরূপ উন্মোচন করেন। সেই অদ্ভুত রূপান্তরের মুহূর্তটিকে লেখক গভীর সামাজিক পর্যালোচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন—

> "এক মুহূর্তে বাঘ দেবতা হইয়া গেল। কাহার শাপে তিনি ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিয়াছেন, কেনই বা এই গ্রামের নিরীহ বাঙালী সন্তানকে এতক্ষণ ধরিয়া ছলনা করিলেন এবং চাটুয্যেগিন্নীই বা শকটারূঢ় মৃত ব্যাঘ্রদেহ দেখিয়া কি করিয়া চিনিলেন, এ সকল বিষয়ে চাটুয্যেগিন্নীকে কেহ কোনো প্রকার প্রশ্ন করারও প্রয়োজন বোধ করিল না।"[৮]

ভয় থেকে যে শ্রদ্ধার জন্ম এবং মানুষের অক্ষমতা যে কীভাবে অবলীলায় লৌকিক দেবতাতত্ত্বের জন্ম দেয়, সরোজকুমার কোনো সমাজতাত্ত্বিক তর্কের জটিলতায় না গিয়ে কেবল লোকব্যবহারের নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মৃত্যু নামক শাশ্বত সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের চৈতন্য কীভাবে বাইরের জগত ও ভেতরের অনুভূতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে, তা অসামান্য তীব্রতায় রূপায়িত হয়েছে 'মৃত্যুর রূপ' গল্পে। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত কথকের কাছে বাইরের পূজার আনন্দ, ঢাক-সানাইয়ের বাদ্য কিংবা থিয়েটারের প্রস্তুতি এক লহমায় অর্থহীন হয়ে পড়ে। মৃত্যুর আগমন কোনো অলৌকিক আতঙ্কে নয়, বরং শরীরের ক্রমশ অসাড় হয়ে আসার অনুভূতির মধ্য দিয়ে ধরা দেয়। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন কবিরাজ ও ডাক্তারের হতাশ শিরঃসঞ্চালন প্রত্যক্ষ হয়, তখন মৃত্যু আর কোনো বিমূর্ত কল্পনা থাকে না। কিন্তু এই ব্যক্তিগত বিদায়ের মুহূর্তে লেখক চেয়ে দেখেছেন তাঁর চারপাশের প্রিয়জনদের দিকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কথক যখন মৃত্যুর অন্ধকার থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁচে ফিরলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন মৃত্যুর স্বরূপ কোনো দানবীয় মূর্তিতে থাকে না; মৃত্যুর নিষ্ঠুরতম রূপ ধরা পড়ে জীবিত প্রিয়জনদের অবর্ণনীয় কাতরতার মধ্যে। পুনর্জীবন লাভের সেই অতলান্ত উপলব্ধিকে লেখক গভীর ভাবাবেগে ব্যক্ত করেছেন—

> "তাকে দেখলাম, আমার বৃদ্ধ পিতার ভূলুণ্ঠিত দেহে, আমার মায়ের উদাসীন রূপে, আমার স্ত্রীর ধূমাঙ্কিত চোখের কোটরে। তাকে দেখলাম, একান্ত প্রিয়জনের উদ্বিগ্ন চোখের কাতরতায়। কি নিষ্ঠুর সে রূপ!"[৯]

জীবনের অন্তিম প্রান্তে মানুষের ক্ষুদ্র অহমিকা ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং মৃত্যুর ছায়াপাত কীভাবে চারপাশের অতি-পরিচিত মানুষগুলির ভিত কাঁপিয়ে দেয়, সরোজকুমারের এই অন্তর্দৃষ্টি বাংলা কথাসাহিত্যে দার্শনিক ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

'শনি রবি সোম' গল্পে লেখক নাগরিক কেরানী জীবনের ট্র্যাজিকমেডিকে এক অনন্য স্নিগ্ধতায় চিত্রিত করেছেন। আধুনিক জীবনের যান্ত্রিক জটিলতা মানুষকে কীভাবে তার মাটির শিকড় ও স্বস্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তার প্রতীক দত্ত মহাশয়। জার্মোলিন লিমিটেডের সামান্য কর্মী দত্ত মহাশয় সারা সপ্তাহের খাটুনির পর শনিবারের সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে গ্রামের বাড়িতে ছুটে যান একটুখানি শান্তির আশায়, কৃষিকর্মের মাধ্যমে মাটির সাথে যুক্ত হওয়ার বাসনায়। কিন্তু গ্রামীণ বাস্তবতার সঙ্গে নাগরিক কেরানীর এই সংযোগপ্রয়াস পদে পদে বিড়ম্বনায় পর্যবসিত হয়। একটিমাত্র মোষ নিয়ে চাষ করার অক্ষম চেষ্টা এবং বৃষ্টিভেজা রাতে স্টেশনে নেমে চাকরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা— এই আপাত-হাস্যকর পরিস্থিতির আড়ালে লুকিয়ে থাকে মধ্যবিত্তের এক অতলান্ত ক্লান্তি ও অসহায়তা।

বৃষ্টিভেজা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দত্ত মহাশয়ের সেই বিড়ম্বিত রূপ এবং তাঁর জীবনসংগ্রামের ব্যর্থতাকে লেখক এক অদ্ভুত স্মিত কৌতুকের আবহে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঝড়ের রাতে স্টেশন মাস্টারের অট্টহাসির বিপরীতে দত্ত মহাশয়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

> "মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দত্ত মহাশয় বলিলেন, গতিক সেই রকমই। বর্ষা পড়ে গেল। লোকের অর্ধেক জমি আবাদ হয়ে গেল। আর আমি ওই আধখানা মোষ নিয়ে কি করি বলুন তো!"[১০]

এই 'আধখানা মোষ' কেবল একটি কৌতুককর পরিস্থিতি নয়, তা নগর ও গ্রামের মাঝখানে ঝুলন্ত আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের অসম্পূর্ণতা ও পঙ্গুত্বের এক তীব্র ব্যঙ্গাত্মক রূপক। এই সামান্য কেরানীর সংসারের খুঁটিনাটি হতাশাটিই সরোজকুমারের গভীর সহানুভূতিশীল কলমে শিল্পরূপ লাভ করেছে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজন্মের যে সংঘাত এবং স্থিতির সঙ্গে গতির যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব, তা অনবদ্য রূপ পেয়েছে 'বনস্পতির দুঃখ' গল্পে। প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো একটি পরিবারের বয়োবৃদ্ধ পিতা নিজের চিরাচরিত আদর্শ ও বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে সংসারকে অটুট রাখতে চান। কিন্তু আধুনিক যুগের গতিশীলতা তাঁর সেই স্বপ্নকে চুরমার করে দেয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুত্ররা যখন পিতৃতান্ত্রিক গণ্ডি ভেঙে বাইরে পা বাড়ায়, তখন বৃদ্ধের মনে হয় সমগ্র সংসারটিই যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। পিতার আদর্শনিষ্ঠ গৃহকোণ এবং আধুনিক উত্তরপ্রজন্মের বাস্তবমুখিতার এই বিরোধে কেউ দোষী নয়; অথচ এই রূপান্তর বৃদ্ধ পিতার বুকে রেখে যায় এক গভীর দীর্ঘশ্বাস।

নিঃসঙ্গ স্থবিরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত সেই বৃদ্ধ পিতার মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক প্রকৃতির রূপকে এক গভীর কাব্যময়তার সৃষ্টি করেছেন। যুগের এই ভাঙন দেখে বৃদ্ধের অন্তরের গভীর বেদনাটিকে ফুটিয়ে তুলে গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে—

> "আতাগাছের দিকে অন্ধকার যেন আলকাতরার মতো জমাট বাধবে। কে জানে আজ কি তিথি। চাটুয্যেদের নারিকেল গাছের আড়ালে এক ফালি বাকা চাঁদ উঠবে কিনা। ওঠে যদি, বনস্পতির দুঃখ সে হয়তো বুঝবে।"[১১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই চাঁদ এবং নিস্তব্ধ অন্ধকারের পটভূমি পিতৃতন্ত্রের পতন ও আধুনিক কালের ঝড়ে ভেঙে পড়া এক প্রাচীন বনস্পতির হাহাকারকে শাশ্বত এক বিষাদে মণ্ডিত করেছে। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের এই অবধারিত বিচ্ছিন্নতা সাধারণ চোখে কেবল বয়সের স্বাভাবিক দূরত্ব বলে মনে হলেও, সরোজকুমারের চোখে তা ধরা দিয়েছে মহাকাব্যিক বেদনার রূপ নিয়ে।

অন্যদিকে, 'নিবারণের মৃত্যু' গল্পে সরোজকুমার দেখিয়েছেন কীভাবে এক ক্ষুদ্র হকারের মৃত্যু সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রবাহের সুবিশাল গতির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ায়। ট্রেনের হকার নিবারণের মৃত্যু তার হতদরিদ্র স্ত্রী ও সন্তানের কাছে সর্বনাশা হলেও, এই দ্রুতগামী পৃথিবী বা ট্রেনের যাত্রীদের কাছে তা বিন্দুমাত্র আলোড়ন তোলে না। এই নির্মম বৈপরীত্য বাংলা ছোটগল্পে অত্যন্ত দুর্লভ। জীবনের চরমতম ট্র্যাজেডি যখন ঘটে, তখন নিবারণের স্ত্রী তরুবালা সংসারের সমস্ত অভাব ও দুঃখের হাত থেকে সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এক নিঃসঙ্গ ডোবার জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এই ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতি একজন প্রান্তিক মানুষের জীবনে কতখানি অপরিহার্য, তা লেখক গভীর জীবনবোধ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

সেই অভাবক্লিষ্ট বাস্তবতার মাঝে তরুবালার চেতনার স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তটি সরোজকুমারের গভীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির শ্রেষ্ঠ স্মারক। সেই ক্ষণস্থায়ী মুক্তির রূপটি নির্দেশ করে ভূমিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যথাযথভাবেই তুলে ধরা হয়েছে—

> "পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ডোবার জলে আকণ্ঠ ডুবে থেকে নিবারণের স্ত্রী তরুবালা যেমন সংসারের সুখদুঃখ থেকে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, তারপর ঘোষাল-গিন্নির কণ্ঠস্বরে জেগে উঠে আবার রূঢ় পৃথিবীর মুখোমুখি এসে দাড়াল, লেখকের ভাষায় তার চোখে যে ভাবে তখন বিস্মৃতির তিমির বিদীর্ণ করে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ — ঠিক তেম্নি অথচ তার চেয়েও সচেতন, স্থায়ী ও বিশুদ্ধ আত্মবিস্মৃতি এবং অনেকটা তার মতই মানবসংসার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যপূর্ণ অনুরক্ত দৃষ্টি যে কোনো সৎ শিল্পীর সজাত হওয়া চাই।"[১২]

এই আত্মবিস্মৃতি এবং আবার রূঢ় বাস্তবতায় ফিরে এসে সংসারের সাথে যুদ্ধ করার লড়াই প্রমাণ করে যে, সরোজকুমার প্রান্তিক মানুষের অতি তুচ্ছ মুহূর্তগুলির মধ্যেও মানবজীবনের অমর মর্যাদাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

সমগ্র আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর কথাসাহিত্যের প্রধান শক্তি ছিল মানবজীবনের অনালোকিত ও প্রান্তিক মুহূর্তগুলির গভীর পর্যবেক্ষণ। কল্লোল যুগের সমসাময়িক সাহিত্যিক আলোড়নের মধ্যে থেকেও তিনি সাময়িকতার কৃত্রিম ফ্যাশনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। নারীর অবদমিত হৃদয়ানুভূতি, কিশোরী মনের অকাল পরিণতি, দাম্পত্যের প্রাত্যহিক অসঙ্গতি, লোকায়ত সংস্কারের জটিল মনস্তত্ত্ব কিংবা মৃত্যুর পদধ্বনি— সবক্ষেত্রেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন সেইসব উপাদান, যা সাধারণ দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর সংযত ভাষা, সূক্ষ্ম কৌতুক এবং প্রকৃতির সুবিশাল পটভূমিতে মানুষের ক্ষুদ্র সংসারের লড়াইকে রূপ দেওয়ার যে অসামান্য কুশলতা, তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবনের উপেক্ষিত খুঁটিনাটিকে শাশ্বত শিল্পমূল্যে রূপায়িত করাই সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ছোটগল্পের সবচেয়ে মহৎ ও স্থায়ী অবদান।

Reference:

১. রায়চৌধুরী, সরোজকুমার, সরোজকুমারের শ্রেষ্ঠগল্প, বিহার সাহিত্যভবন লি:, প্রথম প্রকাশ ১৪-ই এপ্রিল, ১৯৫৬, কলকাতা-৪, পৃ. ২
২. তদেব, পৃ. ৪
৩. তদেব, পৃ. ৪
৪. তদেব, পৃ. ৪
৫. তদেব, পৃ. ১২
৬. তদেব, পৃ. ২৭

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 05
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 44 - 52
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭. তদেব, পৃ. ৩৪
৮. তদেব, পৃ. ৫০
৯. তদেব, পৃ. ৫৯
১০. তদেব, পৃ. ৬২
১১. তদেব, পৃ. ৬
১২. তদেব, পৃ. ৭

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থ :

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ; সাহিত্যে ছোটগল্প; ডি. এম. লাইব্রেরী; প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬; কলকাতা।
সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার; কল্লোল যুগ; ডি. এম. লাইব্রেরী; প্রথম প্রকাশ ১৯৫১; কলকাতা।
মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার; কালের পুত্তলিকা: বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর; দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮; কলকাতা।
দাশ, শিশিরকুমার; বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩–১৯২৩); দে'জ পাবলিশিং; প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩; কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; মডার্ন বুক এজেন্সী; প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯; কলকাতা।

সহায়ক পত্রিকা :

মজুমদার, সন্তোষকুমার (সম্পা.); কল্লোল; কল্লোল পাবলিশিং হাউস; ১৯২৩; কলকাতা।
রায়, মুরলীধর ও রায়চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র (সম্পা.); কালি-কলম; কালি-কলম কার্যালয়; ১৯২৬; কলকাতা।
ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ (সম্পা.); ভারতী; আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস; ১৮৭৭; কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.); প্রবাসী; প্রবাসী কার্যালয়; ১৯০১; কলকাতা।